40

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবো কি ?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৯৯৩-৯৪ সালের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আমরা যারা অকৃতকার্য হয়েছি কিংবা প্রত্যাশিত Subject chance পাইনি, তাদের সবাই ছিল ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী, যাদের সবাই ছিল রচনামূলক প্রশ্নের পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রী। তাই তাদের সেই কষ্টার্জিত পরীক্ষার নম্বর ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (যারা ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করবে) ছাত্রীদের নম্বরের সাথে তুলনীয় নয়। কারণ তাদের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছিল Objective type-এ। তারা আনুপাতিক হারে কম পরিশ্রম করেও যথেষ্ট নম্বর পেয়েছে। অর্থাৎ, আমরা যে পরিশ্রম করে First division পেয়েছি, তারা সে পরিশ্রম করে Star mark পেয়েছে। আর যে পরিশ্রম করে আমরা Star mark পেয়েছি সে পরিশ্রম করে তারা ৮৫০ থেকে ৯০০ নম্বর পেয়েছে। মোটের উপর তারা আমাদের চেয়ে কম করে হলেও ১০০ নম্বর এগিয়ে আছে। যা তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার মেধা স্কোর নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, তারা বিনা পরিশ্রমে স্কোর নম্বরে আমাদের চেয়ে ৪/৫ নম্বর এগিয়ে থাকবে। তার মানে তারা আমাদেরকে এমনিতেই ৬০০ থেকে ৭০০ জন ছাত্র-ছাতরীর পিছনে ফেলে দিবে। যাতে আমাদের ফল হবে আশঙ্কাজনক।

অতএব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য ভর্তি পরীক্ষায় মেধা স্কোর নির্ণয়ে সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সঠিক ও ন্যায় মানদণ্ডের ভিত্তিতে আমাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগদান করে আমাদের উচ্চ শিক্ষার পথকে সুগম করতে সহায়তা করলে কৃতার্থ হবো।

সাইফুল ইলসাম,
কুমিল্লা।

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এবার কি নিয়ম হবে—

সরকারী এবং বেসরকারী মেডিকেলে প্রতি বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে শতকরা হারে মার্ক যোগ করা হয়। কিন্তু এবার অবজেক্টিভ থেকে পাস করা ছাতর-ছাত্রীরাও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। যেখানে একজন পরীক্ষার্থীর ৭০০ নম্বর পাবার কথা অবজেক্টিভের সুবাদে সে পাবে ৮০০ নম্বর। এমতাবস্থায় তাদের মোট মার্কস অবজেক্টিভ থেকে পাস না করা ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী হবে।

যার ফলে নম্বর যোগের একই নিয়ম উভয় পদ্ধতির পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বহাল থাকলে অবজেক্টিভ থেকে পাস না করা প্রার্থীরা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমতাবস্থায় সকল ধরনের পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি গ্রহণযোগ্য ও বিবেচনাপ্রসূত পরীক্ষার নিয়ম প্রকাশ করার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি।

—ফারজানা ইসলাম শম্পা,
ও; আর, নিজাম রোড,
চট্টগ্রাম।

শিক্ষায় শুভংকরের ফাঁক

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যা আছে। এ সমস্যার জটিল বৃত্তে আটকা পড়েছে আমাদের শিক্ষার্থীরা। গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা আর শহরের শিক্ষার তফাৎ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পল্লীর শিক্ষার্থীরা যেখানে পান্তা ভাত মুখে দিয়ে পাঠশালায় যায়, ভাঙা বেঞ্চ, ঢেউটিন কিংবা ছনের তৈরী ছাদের নিচে একই সাথে শ' দেড়েক ছাত্র-ছাত্রী নির্দিষ্ট শিক্ষকের অধীনে কোন রকমে পাঠপর্ব শেষ করে, সেখানে শহুরে শিক্ষার্থীরা সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষে, অত্যাধুনিক উপায়ে একাধিক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে অধ্যয়নের সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে হাজারো কিণ্ডার গার্টেন। যেগুলো গ্রামের শিক্ষার্থী এবং গরীব পরিবারের ছেলে-মেয়েদের নাগালের বাইরে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেসরকারী পাঠশালায় যেখানে কেবল বাংলা, নামেমাত্র ইংরেজী, সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্ম এসব বিষয়গুলোতেই পাঠদান করা হয়, সেখানে কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষার্থীরা এর বাইরেও তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করছে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও গ্রামের শিক্ষার্থীদের পদচারণা নির্দিষ্টবৃত্তেই সীমাবদ্ধ। ফলে সৃষ্টি হয়েছে দুটো ভিন্ন স্রোতধারা। আর এজন্য দেখা যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থীরা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। সর্বোপরি রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা। ফলে, মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনে যেমন ভাল কলেজে ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়, ঠিক তেমনি উচ্চ মাধামিক পরীক্ষার পরই শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল, বুয়েট ইত্যাদি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রতিযোগিতা। আর এ সুযোগকে অতি সুকৌশলে গ্রহণ করেছে চমক লাগানো নাম দিয়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার। আর প্রতিটি কোচিং সেন্টার নিজস্ব সুনামের (লাভজনক ব্যবসা) প্রত্যাশায় বোর্ড স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন টোপ দেখিয়ে ভর্তি করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করছে। যেখানে ভর্তি ফি দেড় হাজার থেকে প্রায় দু'হাজার টাকা। বিভ্রান্ত হচ্ছে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। ফলে, শিক্ষা উপকরণের বাইরে কোচিং ফি, প্রাইভেট ফি ইত্যাদি মেটাতে গিয়ে অভিভাবকদের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা। অন্যদিকে প্রতি বছরই মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে, স্বাধীনতার ২৩টি বছর পরও আমাদের শিক্ষার্থীরা সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার দরুন মানসিক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। উপরন্তু হাতে-কলমে শিক্ষার পরিবর্তে পুঁথিগত শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃষ্টি করেছে শুভংকরের ফাঁক।

ফলে, আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীদিনের বেকার হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। জাতি এগুতে পারছে না উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কর্তৃপক্ষকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে আমাদের রুগ্ন শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে জাতি শিক্ষিত বেকারের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারে।

—আরিফ মাহমুদ;
৫২৫, কবি জসীম উদ্দীন হল,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।